

পরিবেশ উন্নয়নে বনায়ন ও বনসম্পদ : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত কাজী হাসান ইমাম*

ভূমিকা

পরিবেশ উন্নয়নে বনাঞ্চল সংরক্ষণ ও বনায়নই একমাত্র উপায় নয়। মানুষের নানাবিধ কার্যক্রম ছাড়াও প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান পরিবেশের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। সে কারণে শুধুমাত্র বনাঞ্চল সংরক্ষণ ও বনায়নের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে পরিবেশ উন্নয়ন সম্ভব নয়। তবে বিশ্বব্যাপী বনোজাড়ের কারণে সৃষ্ট পরিবেশ বিপর্যয়ের বিবিধ প্রতিক্রিয়া বিশ্ববাসীকে শংকিত করে তুলেছে। পরিকল্পিতভাবে হোক আর অপরিকল্পিতভাবে হোক মানুষ তার প্রয়োজনে বনোজাড় করছে ; আবার পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের ভারসাম্যহীন পরিবর্তন একদিকে যেমন বনোজাড় প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে, অন্যদিকে বনোজাড়ের কারণে সৃষ্টি হচ্ছে নানাবিধ পরিবেশ বিপর্যয়।

বিশ্বব্যাপী বনোজাড়ের প্রকৃতি ও তার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ভয়াবহ। গহীন অরণ্যাঞ্চল বলে আফ্রিকা মহাদেশের যে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ছিল, আজ তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে ; অনেক দেশ থেকে উধাও হয়ে গেছে সবুজ বন ; দেখা দিচ্ছে প্রচণ্ড জ্বলানী সংকট ; বিস্তৃতি ঘটছে সাহারার ; খরার কবলে ধুঁকে ধুঁকে মরছে মানুষ ; কোথাও কোথাও দেখা দিচ্ছে ঘন ঘন বন্যা, ভূমিক্ষয়, ভূমিধ্বস ; বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ। ১৯৯০ সালে ঘানার বনভূমির পরিমাণ ছিল ৮৮ হাজার বর্গকিলোমিটার। আজ সেখানে বনভূমির পরিমাণ কমতে কমতে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১৭০০ বর্গকিলোমিটারে। একইভাবে গত পাঁচশত বছরে চিলির ৭০ লক্ষ হেক্টর বনভূমির শতকরা ৫৮ ভাগ নিঃশেষ হয়ে গেছে। চীনে প্রতি বছর ৬.৭ মিলিয়ন হেক্টর বনভূমি উজাড় হয়ে যাচ্ছে। বনোজাড়ের বর্তমান প্রকৃতি অব্যাহত থাকলে আগামী দু'হাজার সাল নাগাদ ফিলিপাইন্স-এ আর কোন বনভূমি থাকবেনা বলে সেখানকার বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। বিশ্বব্যাপী ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বন গড়ে উঠতে সময় লেগেছে ১০ কোটি বছর। কিন্তু বর্তমানে যে হারে এই বনের বিনাশ চলছে তাতে আগামী এক শতাব্দির মধ্যে তা উজাড় হয়ে যাবে বলে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা আশংকা প্রকাশ করছেন। যাটের দশকের ইন্দোনেশিয়ার ১৪৩ মিলিয়ন হেক্টর বনরাজির এখন মাত্র ৩২ মিলিয়ন হেক্টর অবশিষ্ট আছে। বাংলাদেশের বনোজাড়ের গতি প্রকৃতিতেও মোটামুটি একই ধারা বহমান।

* উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা-১৩৪৩।

পৃথিবীর সবচেয়ে জন-অধ্যুষিত দেশের একটি হচ্ছে বাংলাদেশ। কিন্তু ন্যূনতম প্রয়োজনের তুলনায় এর বনভূমির পরিমাণ অনেক কম। যা আছে, অঞ্চলভেদে তার বন্টনও খুবই অসম। দেশের বার্ষিক বনোজাড়ের পরিমাণ প্রায় ০.৫৫ শতাংশ বা ১৭৯,২৮৮ একর (Ali, 1990, পৃ.১)। দারিদ্র, জনসংখ্যার দ্রুত প্রবৃদ্ধি এবং ভূমির ওপর অত্যাধিক চাপ এই বনোজাড় প্রক্রিয়াকে আরো ত্বরান্বিত করছে। এ সমস্ত কারণে মারাত্মক পরিবেশ ও প্রতিবেশ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এবং ফলশ্রুতিতে আবর্তক প্রাকৃতিক দুর্যোগে অপরিমেয় ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এদেশের অর্থনীতি ও জনপদ। আর তাই, পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়নে বনাঞ্চল সংরক্ষণ ও বনায়ন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

সুদূর অতীতকাল থেকেই বংগদেশ নামক এই ভূ-খণ্ডটি ছিল ঘন অরণ্যে পরিপূর্ণ। ক্রান্তীয় জলবায়ু ও উর্বর মাটির কারণেই এখানে সৃষ্টি হয়েছিল একটি চিরহরিৎ অরণ্যের ঘন আচ্ছাদন (Rashid, 1977, পৃ. ১২৯)। মূলত: ব্রিটিশ ঔপনিবেশিককাল থেকেই এদেশে শুরু হয় ব্যাপক অরণ্য নিধনযজ্ঞ। এ সময়ে খুব সীমিত পরিসরে বৃক্ষায়নের মাধ্যমে নতুন বন সৃষ্টির প্রক্রিয়া চালু থাকার চিত্র পাওয়া গেলেও ধীরে ধীরে বন কেটে কৃষির পত্তন ঘটানো হয়; গড়ে ওঠে জীবন সংগ্রামী বসতি এবং নির্বিচারে উজাড় হ'তে থাকে এদেশের বনসম্পদ। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে এবং পরবর্তীতে বনের এই নিধনযজ্ঞ, বিশেষত: গ্রামীণ বনোজাড় বেড়ে চলে আরো দ্রুতগতিতে। দ্রুত গ্রামীণ বনোজাড়ের সংগত কারণ হিসেবে এখানে ১৯৭১ সালের বন্যা, যুদ্ধকালীন ক্ষয়ক্ষতি ও ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষকে দায়ী করা হয়। এ সময়ে মানুষ নির্বিচারে বাড়ীর আশে-পাশের গাছ-পালা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে বেছে নেয়। দারিদ্রের চরম নিপীড়নে গ্রাম-বাংলায় এ প্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত।

কিন্তু “....একটি এলাকার সুস্থিত উদ্ভিজ্জ বা ‘কলাইম্যাক্স ভেজিটেশন’ বিনষ্ট হওয়ার অর্থ কতগুলো গাছপালা নির্মূল হওয়া নয়—সেই সংগে প্রাণিকুল, কীটপতঙ্গ প্রভৃতিও নির্মূল হয়ে যাওয়া, ‘ট্রাফিক লেভেল’ বা অস্তিত্ব স্তরসমূহের অবলুপ্তি হওয়া, ‘ইকোসিস্টেম’ বা বাস্তুব্যবস্থার বিপর্যয় আসা....” (চৌধুরী, ১৯৮৮, পৃ. ২২)। সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে এখনই এ চেতনাবোধের উৎসারণ ঘটানো না গেলে বাংলাদেশ নামক এই ভূখণ্ডটি ক্রমাগত আরো বনহীন হয়ে পড়বে এবং অদূর ভবিষ্যতে অপ্রতিরোধ্য আর্থ-পরিবেশ ও প্রতিবেশগত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।

উন্নয়ন পরিকল্পনায় বাংলাদেশের বনসম্পদ সুদীর্ঘ কালের এক অবহেলিত অধ্যায়। কালের অবধারিত প্রবাহে ভবিষ্যতের বাসযোগ্য পৃথিবীর জন্য মানুষ খুঁজে ফিরছে অর্থনীতি ও পরিবেশ-প্রতিবেশের মধ্যে একটি সুসামঞ্জস্য সম্পর্ক ও সুষ্ঠু সমন্বয় (Zellentin, 1987, পৃ. ১১)। বাংলাদেশও এখন আর এই চেতনাবোধের বাইরে নয়। তাই সূচনালগ্নে এ প্রবন্ধের বিশ্লেষণ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও উপকারে আসবে বলে আশা করা যায়।

বনসম্পদের পরিবেশ-গুরুত্ব

বনভূমি প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন, বন্যা, খরা, অতিরিক্ত তাপমাত্রা, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে ও বায়ুশোধন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (FFYP, 1990, পৃ. V.E. 1)। দুটি বসতির মাঝখানে যদি বিস্তৃত একটি সবুজচত্বর (বনভূমি) থাকে তাহলে শুধুমাত্র ঐ বনভূমি এলাকার বায়ুই যে তা'দ্বারা প্রভাবিত হবে তা' নয়, বরং তা' উক্ত বসতি দুটির জন্য বায়ুর-গতি নিয়ন্ত্রকের কাজ করবে ; বনাঞ্চল ছাড়াও তার চারপাশের বহুদূর পর্যন্ত বায়ুর আর্দ্রতা ঘনীভূত করবে ; এই ঘনীভবনের মাধ্যমে বায়ুতে অবস্থিত দূষিত পদার্থের পরিবহনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে এবং বৃষ্টিপাত, কুয়াশা ও তুষারপাত ইত্যাদির মাধ্যমে বায়ু শোধিত হবে (Geiger, 1961, পৃ. ৬১)। বসতির ঘনত্ব ও উল্লম্বিক উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে কোন স্থানের বায়ুঘনত্ব ও বায়ুর গতিমাত্রা কমতে থাকে ; ফলত: স্থানটিতে আবহাওয়া ও জলবায়ুগত ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয় (Miess, 1978, পৃ. ৮৭)। পরিমিত বনাঞ্চল সৃষ্টির মাধ্যমে এসমস্ত এলাকার পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং আবহাওয়া ও জলবায়ু সংক্রান্ত ভারসাম্যহীনতা নিরসন করা যায়।

“শব্দদূষণ” আধুনিক পরিবেশ বিজ্ঞানের একটি বিশেষ বিবেচনাযোগ্য দিক। শব্দদূষণ প্রক্রিয়াকে স্তিমিত করতে বনবৃক্ষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। উদাহরণত উন্নত বিশ্বের মহাসড়কগুলোর পাশে অবস্থিত বসতিসমূহকে শব্দদূষণের হাত থেকে রক্ষার্থে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে উক্ত স্থানে মহাসড়কের দু'পাশে বিশেষ প্রজাতির বৃক্ষ রোপণ করা হয়। অত্যন্ত আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, এ জাতীয় বৃক্ষায়ণের ফলে মহাসড়কে উৎপন্ন বিকট শব্দ বসতিতে পৌঁছে না, যদিও বসতিগুলো মহাসড়কের অতি সন্নিহিত অবস্থিত। শব্দদূষণ থেকে বসতিকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে চিরহরিৎ পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনায়ন অত্যন্ত কার্যকরী। চিরহরিৎ পত্রযুক্ত ঝাকড়ানো বৃক্ষের মাঝে মাঝে সূঁচাকার পত্রযুক্ত বৃক্ষ (যেমন, ঝাউগাছ) রোপণের মাধ্যমে এই “শব্দদূষণ প্রতিরোধক বৃহৎ”কে অধিকতর কার্যকরী করা যায় (Haupt, 1973-74, পৃ. ৩১)।

বর্তমান বিশ্বের বহুল আলোচিত “গ্রীণ-হাউস প্রভাব” প্রশমিতকরণে বনের ভূমিকা অপরিণীম। গ্রীণ-হাউস প্রভাব সৃষ্টিকারী গ্যাসের ৪৯ শতাংশ হচ্ছে কার্বন ডাই-অক্সাইড (মণ্ডল, ১৯৯৪, পৃ. ২)। শুধুমাত্র বিশ্বের বনাঞ্চল সংরক্ষণ বা অধিকতর বনায়নের মাধ্যমে পৃথিবীকে এ প্রভাব থেকে মুক্ত করা যাবে না সত্যি, কিন্তু বিভিন্ন উৎস থেকে প্রতিনিয়ত যে হারে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে মিশছে, উদ্ভিদের প্রস্বেদন ও সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পরিশোধনে সক্ষম। পৃথিবীকে গ্রীণ হাউস প্রভাব থেকে বাঁচাবার ক্ষেত্রে পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা যেসমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণের উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম তিনটি পদক্ষেপ হচ্ছে বনাঞ্চল সংরক্ষণ, অধিকতর বনায়ন ও জ্বালানী ব্যবস্থার উন্নয়ন (সিদ্দিকী, ১৯৯৪, পৃ. ৯)। আর এ তিনটি পদক্ষেপের সাথে বনসম্পদের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।

ভূমিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় স্থিতিশীলতা রক্ষায় এবং পানিসম্পদ উন্নয়নে বনের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। বনহীন এলাকার ভূমি নিম্ন-জলপ্রবাহের তীব্রতা বন এলাকার ভূমি নিম্ন-জলপ্রবাহ থেকে অনেক বেশী। বৃক্ষরাজি মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি ধরে রাখতে সহায়তা করে এবং ভূমি নিম্ন-জলস্রোতের তীব্রতাকে হ্রাস করে। এভাবে বৃক্ষরাজি কৃষি উৎপাদনে এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বনের এই প্রভাবসমূহ বন এলাকার বাইরেও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে (Barner, 1983, পৃ. ৩১-৩৪)। পানিশোধন ও পানির জীবরাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যেমন, অক্সিডাইজেশন, ভূমিস্থিত সালফার ডাই-অক্সাইডের প্রতিক্রিয়া নিরাময়করণ ইত্যাদিতে বনের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে (Barner, 1983, পৃ. ১৫৯-১৬০)। চিরহরিৎ বনরাজি মাটির ক্ষয়প্রাপ্তি ও ভূমিধ্বস রোধ করে। আইভরি কোস্টের বনভূমিসমৃদ্ধ উপত্যকায় প্রতি বছরে যেখানে হেক্টর প্রতি মাত্র ৩০ কেজি মাটি বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে যায়, সেখানে বৃক্ষহীন উপত্যকা থেকে মাটি নিষ্কাশনের পরিমাণ বছরে হেক্টর প্রতি ১৩৮ টন (সিদ্দিকী, ১৯৯৪, পৃ. ৭)। এ তথ্য থেকেই মাটির ক্ষয়রোধে চিরহরিৎ বনরাজির গুরুত্ব প্রমাণিত হয়।

উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে জ্বালানী ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আসলেও তৃতীয় বিশ্বের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কাঠ ও জ্বালানী হিসেবে বনসম্পদের ব্যবহার প্রাধান্য পেয়ে থাকে। একথা উল্লেখ্য যে, আজ থেকে মাত্র এক শতাব্দি আগেও সারা বিশ্বে বনজ-জ্বালানীই ছিল জ্বালানী শক্তির প্রধানতম উৎস। ধীরে ধীরে প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটেছে, আবিষ্কৃত হয়েছে নানা খনিজ পদার্থ এবং জ্বালানী শক্তির উৎসের স্বরূপ ব্যাপকভাবে পাল্টে গেছে পৃথিবীব্যাপী। কিন্তু বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর হাতে এমন কোন আলাদীনের প্রদীপ নেই যা দিয়ে রাতারাতিই তারা তাদের জ্বালানী শক্তির উৎসের স্বরূপকে ভেল্কিবাজির মত পাল্টে দিতে পারে। আর তাই, জ্বালানীর ক্ষেত্রেও “বনজ-জ্বালানী” আজও এসকল অঞ্চলে প্রধানতম উৎস হিসেবে বিবেচিত। এছাড়া বনসম্পদ কাঠভিত্তিক শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়; শ্রমশক্তি নিয়োগের ক্ষেত্রে বনভিত্তিক শিল্পের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বনসম্পদের অবদান অনস্বীকার্য। দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) ক্ষেত্রে বনসম্পদ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। বনভূমি থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন দ্রব্যাদি দেশের অভ্যন্তরে ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং সামগ্রিকভাবে অন্য সম্পদের ওপর চাপ কমিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করে।

বাংলাদেশের বনপরিস্থিতি এবং তার আর্থ-পরিবেশ ও প্রতিবেশগত প্রভাব

একটি দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণে এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে ঐ দেশের মোট আয়তনের ন্যূনপক্ষে ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা আবশ্যিক (চৌধুরী, ১৯৮৮, পৃ. ৬১)। কিন্তু বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জিতে ১৯৮৫-৮৬ সালে দেশের মোট বনভূমির পরিমাণ ১৩.৪১ শতাংশ দেখানো হয়েছে। একই সময়ে পরিচালিত অর্থনৈতিক জরীপে বনাঞ্চলের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৯.৩ শতাংশ; দি টাস্ক ফোর্স রিপোর্ট, ১৯৯১-তে বনের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে ৯.৮৭ শতাংশ (সারণী-১)। অনেকের মতে এর প্রকৃত পরিমাণ আরো কম। অবশ্য চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রিপোর্ট ও বন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত উপাত্ত অনুসারে বর্তমানে দেশের মোট বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৭ শতাংশ। অন্যদিকে একই জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও বার্মা, নেপাল প্রভৃতি দেশের বনভূমির পরিমাণ অনেক বেশী। ইন্দোনেশিয়ার বনভূমির পরিমাণ প্রায় ৭৫ শতাংশ, যা ইউরোপের তুলনায় ২.৫ গুণ বেশী (The World Bank, 1990, পৃ. xix-xx)।

বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত বনভূমি সংক্রান্ত উপাত্তের ভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞসহ সকল মহল এব্যাপারে একমত যে, বর্তমানে বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ ন্যূনতম সীমারেখারও অনেক নীচে। সমস্যার গভীরতা আরো বেশী অন্যখানে। দেশের বনসম্পদের পরিমাণ যা-ই থাকুক না কেন তা সুষম বন্টিত নয় (সারণী-১ ও ২)। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বনভূমির ৯০ শতাংশেরও বেশী দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় মাত্র ১২টি জেলায় পুঞ্জীভূত; ৬৪টি জেলার মধ্যে ২৮টিতে কোন রাষ্ট্রীয় বনভূমি নেই (FFYP, 1990; পৃ. V.E.1)। মোট বনভূমির মাত্র ৯ শতাংশ রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত। অথচ এ দুটি বিভাগে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৪ শতাংশ বসবাস করে (সারণী-২)। জেলাভিত্তিকভাবে কেবলমাত্র খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও রাংগামাটি এ ৬টি জেলায় পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করার মত প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পরিমাণ বনভূমি আছে; বিভাগভিত্তিকভাবে কোন বিভাগেই প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পরিমাণ বনভূমি নেই (সারণী-১)।

দেশের বনাঞ্চলের এই অপ্রতুলতার কারণে উদ্ভূত আর্থ-পরিবেশ ও প্রতিবেশগত প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া বহুবিধ। সমস্যার উত্তোরণে এগুলোকে ব্যাষ্টিক ও সমষ্টিগত দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সমষ্টিগত প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার একটি দিক হচ্ছে অর্থনৈতিক। ১৯৮৫-৮৬ সাল পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (জিডিপি) বনসম্পদের অবদান ছিল ৫ শতাংশ (অর্থনৈতিক জরীপ প্রতিবেদন, ১৯৮১, পৃ. ১৯ ও ১৯৮৪, পৃ. ৩১ ;

FFYP, 1978, পৃ. ১০৫ ; SFYP, 1983, পৃ. ১৪৩ ; চৌধুরী, ১৯৮৮, পৃ. ৬৬)। ১৯৯০ সালে সেটা কমে দাঁড়িয়েছে ৩ শতাংশে। বৃক্ষরোপণ, গাছকাটা এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি কাজে বনাঞ্চলে যেমন বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, তেমনি বহুসংখ্যক শ্রমিকের দরকার হয় বনসম্পদ নির্ভর শিল্পগুলোতে। দু'এক দশক আগেও দেশের মোট শিল্প সংক্রান্ত শ্রমিকের শতকরা ১৫ ভাগ নিয়োগকরত শুধুমাত্র অরণ্যসম্পদ নির্ভর শিল্পগুলো (চৌধুরী, ১৯৮৮, পৃ. ৬৭)। কিন্তু বনসম্পদের পরিমাণ হ্রাসের সংগে সংগে এই উপখাতে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমছে। বর্তমানে এর পরিমাণ দেশের মোট শ্রমিকের মাত্র ২ শতাংশ (FFYP, 1990, পৃ. V.E.1)।

বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনাঞ্চলের মাত্র ৬১ শতাংশ এলাকা উৎপাদনশীল বনভূমি হিসেবে বিবেচিত ; বাকী এলাকা জোপ-ঝাড়, লতাগুল্ম বা তৃণ আচ্ছাদিত অথবা সম্পূর্ণ বিরানভূমি। প্রকৃতি ও অবস্থানভেদে বনভূমির বক্ষাচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ ৩০ শতাংশ থেকে ৭০ শতাংশ। গুণগত মান বিচারে এসমস্ত এলাকার একটি উল্লেখযোগ্য অংশের বনভূমি খুবই নিম্নমানের। বিগত কয়েক দশক ধরে অতিমাত্রায় বনসম্পদ আহরণ এর মূল কারণ। বক্ষাচ্ছাদিত বনাঞ্চলের পরিমাণ হ্রাসের সাথে সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণতার তীব্রতা (FFYP, 1990 পৃ. V.E.1)। বিগত এক দশকের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। খরা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, পললায়ন, ঝড়-জলোচ্ছাস, বন্যা ও ভূমিক্ষয়ের তীব্রতা বেড়েছে আশংকাজনকভাবে। তুলনামূলক উচ্চভূমিতে অবস্থিত হলেও উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলো প্রায়শই ভয়াবহ আকস্মিক বন্যার সম্মুখীন হচ্ছে ; জনজীবন হয়ে উঠছে অতিষ্ট। আবার শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাবে কৃষিকার্য ব্যাহত হচ্ছে দারুণভাবে। বনভূমি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কারণে উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে ভয়াবহ মরুকরণ প্রক্রিয়া দেখা দিচ্ছে ; দেশের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় কিছু জেলাতেও (যেমন-যশোর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া প্রভৃতি) মরুকরণের প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বনসম্পদ ধ্বংসের কারণে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল কমে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত এ দেশ থেকে ২৩টি প্রজাতির বন্যপ্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ; ২৭টি প্রজাতি বিভিন্ন অসুবিধার মধ্যে আছে এবং ৩৯টি প্রজাতির জীবন হুমকির সম্মুখীন (Nishat, 1993, পৃ. ৪)। বাংলাদেশের যে সমস্ত এলাকাকে পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা “মারাত্মকভাবে পরিবেশ অবক্ষিত” বলে চিহ্নিত করেছেন, তার ব্যাপক অংশের পরিবেশ অবক্ষয়ের মূল কারণ হচ্ছে বনোজাড়া ও বনসম্পদের অপ্রতুলতা (Rashid, 1991 ; Nishat, 1993 পৃ. ১৩-১৪)। এছাড়া প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অন্যান্য জেলাগুলোতেও নিতান্ত কম নয়। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির পঙ্গুত্ব এসমস্ত কারণে বহুলাংশে প্রভাবিত।

সারণি-১ : অঞ্চলভিত্তিক বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ, ১৯৯১

অঞ্চল	বন ভূমির পরিমাণ		
	একর	বর্গ কি: মি:	মোট আয়তনের তুলনায় বনভূমির পরিমাণ (%) *
ঢাকা	২০২১.২৩	৮.১৮	০.৫৮
গাজীপুর	৬২৯৬৫.৫০	২৫৪.৮১	১৪.৪৫
ময়মনসিংহ	৩৮৮২৮.৬৬	১৫৭.১৩	৩.৭৪
টাংগাইল	১২২৭৭৬.০৬	৪৯৬.৮৬	১৪.৬৬
জামালপুর	১০৩৬৪.৩৮	৪১.৯৪	২.০৭
শেরপুর	১৯৪৬৯.১২	৭৮.৭৯	৫.৭০
নেত্রকোনা	২০৭৯.৯৯	৮.৪২	০.২৮
ঢাকা বিভাগ	২৫৮৫০৪.৯৪	১০৪৬.০৮	৩.৩৬
চট্টগ্রাম	৩১৫৬১০.০৮	১২৭৭.২৩	২৫.৮৬
কক্সবাজার	২৪৭৪৮০.৫৩	১০০১.৫২	৪৩.৯৯
বান্দরবন	২৫১৯৭৯.৮৮	১০১৯.৭৩	২২.৩৬
রাংগামাটি	৬৩৮০১২.৫১	২৫৮১.৯৫	৫৮.৪৭
খাগড়াছড়ি	৮৮৪৮৮.৬৫	৩৫৮.১০	১২.৬৫
কুমিল্লা	১৭২০.৯৩	৬.৯৬	০.২৩
নোয়াখালী	৬০১১১.৯৭	২৪৩.২৬	৯.০৪
ফেনী	১৯১.৮৩	০.৭৮	০.০৪
লক্ষ্মীপুর	৪৭৩৫.০০	১৯.১৬	১.১৬
সিলেট	৫১৯০৯.৪৪	২১০.০৭	৬.২৪
হবিগঞ্জ	৩৭৬৪৯.৬৭	১৫২.৩৬	৫.৯১
মৌলভীবাজার	৭০৬৮৩.১৭	২৮৬.০৫	১০.৫৯
সুনামগঞ্জ	২৬৪৭১.৪৪	১০৭.১৩	২.৮৬
চট্টগ্রাম বিভাগ	১৭৯৫০৪৫.১০	৭২৬৪.৩০	১৫.৪৫
খুলনা	৩৫৭৩৯৯.৮৬	১৪৪৬.৩৫	৩৩.১৬
সাতক্ষীরা	৪০০৯৬৪.৮৩	১৬২২.৬৫	৪৩.৩০
বাগেরহাট	৬৬৮৪৩০.০০	২৭০৫.২৫	৬৯.৬৭
পটুয়াখালী	২৬৭৯০.৭৯	১০৮.৪২	২.৫০
বরগুনা	২৮৭৮০.৯৪	১১৬.৪৭	১০.৫৭
ভোলা	৪১৪৯৫.৪৬	১৪৭.৯৩	৫.৬৩
পিরোজপুর	১৩১২.০০	৫.৩১	০.৩৮
খুলনা বিভাগ	১৮৯৮৬৭৪৬.১০	৭৬৮৩.৬৮	২১.৫০
দিনাজপুর	১৮৬৯১.০১	৭৫.৬৪	২.১৩
ঠাকুরগাঁও	১৯৬৮.৭৪	৭.৯৭	০.৪৪
পঞ্চগড়	৪৬৯৫.৮৬	১৯.০০	১.৩৫
নওগাঁ	৭০১০.৬৪	২৮.৩৭	০.৮৩
রংপুর	৩৪১৯.৬৯	১৩.৮৪	০.৬০
নীলফামারী	২৭১৮.৭৭	১১.০০	০.৬৭
কুড়িগ্রাম	৫৩.০৩	০.২১	০.০১
লালমনিরহাট	৮৪.৬৩	০.৩৪	০.০৩
গাইবান্ধা	১.৮৫	০.০১	০.০০
রাজশাহী বিভাগ	৩৮৬৪৪.২২	১৫৬.৩৯	০.৪৫
বাংলাদেশ	৩৬১৭৩৬৮.৪৮	১৪৬৩৮.৯৯	৯.৮৭

উৎস : The Task Forces Report, Vol. Four, 1991.

* পরিসংখ্যান মোতাবেক হিসাবকৃত।

সারণি-২ : বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও বনভূমির আঞ্চলিক বন্টন (শতাংশে),

১৯৮৮

অঞ্চল	জনসংখ্যা (%)	বনভূমির পরিমাণ (%)
রাজশাহী বিভাগ	২৪	২
ঢাকা বিভাগ	৩০	৭
খুলনা বিভাগ	২০	৪২
চট্টগ্রাম বিভাগ	২৬	৪৯
মোট	১০০	১০০

উৎসঃ হোসেন, এম. মোজাম্মেল : বাংলাদেশের বনসম্পদ, জ্বালানী শক্তির চাহিদা ও সম্ভাবনা, একটি গবেষণা (মিমিও), ১৯৯০, পৃ. ৫।

ব্যাপ্তিক দৃষ্টিকোণ বিচারে প্রকৃতি ও অবস্থানভেদে (সংযোজনী-১) বনভূমির বিচিত্রধর্মী সমস্যা বিদ্যমান। অঞ্চল ও অবস্থান ভিত্তিক সমস্যার কিছু পূর্বেই চিহ্নিত করা হয়েছে। নিম্নে বনের প্রকৃতিভিত্তিক সমস্যাবলী সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরা হলো :

পাহাড়ী বন

পাহাড়ী বনভূমির মোট আয়তনের ৭০ শতাংশ মাত্র বক্ষাচ্ছাদিত এবং এরও বেশ কিছুটা নিম্নমানের। প্রজাতিগত দিক থেকে এগুলো দীর্ঘমেয়াদী আবর্তক জাতের এবং কৃত্রিম পুনর্জন্ম অনুসরণের মাধ্যমে “ক্লিয়ার ফেলিং” প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থাপিত হয়। অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনভূমি পার্বত্য জেলাগুলোতে অবস্থিত। সুরণাতীতকাল থেকে অনিয়ন্ত্রিত ঝুমচাষের ফলে এতদঞ্চলের বনভূমি সম্পূর্ণ বক্ষবিহীন হয়ে পড়েছে (Ali 1990, পৃ. ৪); ভূমিক্ষয়ের হারকে বাড়িয়ে দিয়েছে তীব্রভাবে। ফলতঃ সম্পূর্ণ এলাকাটি পরিণত হয়েছে একটি অনুৎপাদনশীল ভূমিতে ; ক্রমাগত ভূমিক্ষয়ের কারণে এলাকার নদীগুলোর নাব্যতা কমে যাচ্ছে ; প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে বনসম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে এবং দেশের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ উৎপাদন উৎস কাপ্তাই হ্রদের আয়ুষ্কাল সীমিত হয়ে আসছে (হোসেন, ১৯৯০, পৃ. ৩)।

প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন

আর্থিক দিক থেকে প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন বা সুন্দরবন বাংলাদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অরণ্য। এই বনাঞ্চলের প্রধান প্রধান প্রজাতিসমূহ যেমন, সুন্দরীবৃক্ষ তারবারতা, বিদ্যুৎবাহী তার ও ঘরের খুঁটি এবং নৌকা তৈরীর জন্য সর্বোৎকৃষ্ট ; শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে গেওয়া, পেন্সিল তৈরীর জন্য ধুন্দল এবং চামড়া পাকা করার জন্য গরান বৃক্ষের বাকলজাত কষ বা ট্যানিন ব্যবহৃত হয়। প্রজাতিভেদে এসকল বৃক্ষের বিচিত্রধর্মী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সুন্দরীবৃক্ষ মৃত্তিকার শুষ্কতা ও লবণাক্ততা সহ্য করতে পারেনা (Ahmed, 1959, পৃ. ১৭-১৮) ; গেওয়াবৃক্ষ শুষ্কতার প্রতি অপেক্ষাকৃত

সহনশীল। ফাংগাস আক্রমণ (Ahmed, 1959, পৃ. ২০) এবং “মাথা মরা” (FFYP, 1990, পৃ. V. E. 9) সুন্দরীবৃক্ষের জন্য একটি ব্যাপক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। এতে প্রাকৃতিক পুনর্জন্ম প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে দারুণভাবে। শতাব্দিকাল থেকেই ব্যাপক এলাকা জুড়ে বছরের পর বছর অনাবৃত এলাকায় বনসৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে না (Curtis, 1933, পৃ. ১৮ ও FFYP 1990-95, পৃ. V. E. 9)। বিগত ২৪ বছরে সুন্দরী ও গেওয়া প্রজাতির সম্পদের পরিমাণ কমেছে যথাক্রমে ৪০ ও ৪৫ শতাংশ; সামগ্রিকভাবে এই বনাঞ্চল উজাড় হয়েছে ২৩ শতাংশ। সাম্প্রতিক এক জরীপে দেখা গেছে যে, সুন্দরবন এলাকার ৬৫ শতাংশ বনভূমির ৭০ শতাংশ বৃক্ষাচ্ছাদিত, ৩০ শতাংশ এলাকার বনভূমি ৩০ থেকে ৭০ শতাংশের কম বৃক্ষাচ্ছাদিত এবং ৫ শতাংশ এলাকার বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ ৩০ শতাংশের কম (Ali, 1990, পৃ. ৬)। ম্যানগ্রোভ বনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু চকোরিয়া সুন্দরবন বা উপকূলীয় বনাঞ্চল। বিগত ২৫ বছরে এর ৪৩ শতাংশ বনাঞ্চল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, অতিরিক্ত বনাহরণ, চিংড়ি চাষ, পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অন্যান্য নানা কারণে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, জোয়ারের স্তর হ্রাস, ঘন ঘন প্লাবন ইত্যাদি এই বনোজাড়ের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত। উপকূলীয় অঞ্চলে বনোজাড়ের কারণে ঝড়-জলোচ্ছাসজনিত ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ অঞ্চলে ব্যাপক বনায়নের মাধ্যমে সামুদ্রিক ঝড়-জলোচ্ছাসের তীব্রতা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব বলে বিশেষজ্ঞমহল মনে করেন (মাসুদ, ১৯৯৩ পৃ. ৫)।

সমতল এলাকার শালবন

সমতল এলাকার শালবনের অবস্থা আরো করুণ ও নিম্নমানের। এ এলাকার বনভূমির মাত্র ৩২ শতাংশ বৃক্ষাচ্ছাদিত (Ali, 1990, পৃ. ৮)। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ব্যাপক আকারে অসদুপায়ে বনোৎসাদন চলে। ইতোমধ্যে এই বনের ৯৫ হাজার ৫ শত ৫৬ একর এলাকা বেদখল হয়ে গেছে। এ অবস্থা নিরসনে সরকার ১৯৭২ সালে সকল প্রকার সরকারী বনভূমি থেকে বনোৎসাদন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু বাস্তবে এ জাতীয় ঘোষণা কোন কাজে আসেনি (FFYP, 1990, পৃ. V. E. 2)। স্থানীয় ক্ষমতাশীল ও লোভী লোকের হাতে এর পরেও চলেছে বনের অননুমোদিত নিধনযজ্ঞ। বর্তমানে সমতল এলাকার শালবনের মাত্র ৩০ শতাংশ বৃক্ষাচ্ছাদিত (FFYP, 199, পৃ. V. E. 2)।

গ্রামীণ বন

কুটির শিল্প ও ছোট ছোট কাঠভিত্তিক শিল্পের কাঁচামালের যোগান দিতে গিয়ে গ্রামীণ বন আশংকাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। দেশের সামগ্রিক জ্বালানী সংকটের কারণে ব্যাপকভাবে গ্রামীণ বনোজাড় চলছে। ফলে ভূমি ও প্রকৃতির মধ্যে মারাত্মক প্রতিবেশ সমস্যার সৃষ্টি করছে (তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রতিবেদন, ১৯৮৩, পৃ. ২১৯)।

বনসম্পদের চাহিদা ও যোগান

বনজ সামগ্রীর ৮০ শতাংশ জ্বালানী কাঠরূপেই ব্যবহৃত হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রতিবেদন অনুসারে, বনজ সামগ্রী দেশের প্রচলিত জ্বালানীর ৭৫ শতাংশেরও বেশী জ্বালানী ব্যবহারের যোগান দেয়। অবশ্য চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রতিবেদন মতে, উক্ত খাতে বনসম্পদের অবদান মাত্র ১৭ শতাংশ এবং বাদবাকী আসে কৃষিজ আবর্জনা, খড়কুটা, গোবর ইত্যাদি থেকে। কেউ কেউ মনে করেন, প্রচলিত জ্বালানীর ক্ষেত্রে বনসম্পদের অবদান ২০ শতাংশ এবং সম্পূর্ণ জ্বালানী কাঠের ৬৯ শতাংশ ব্যবহৃত হয় রান্নার কাজে, ২৩ শতাংশ ইটের ভাটায় এবং ৮ শতাংশ শিল্পজ্বালানী হিসেবে (Ali, 1990, পৃ. ১৩)।

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের মতে, দেশের বর্তমান কাঠ ও জ্বালানী কাঠের মাথাপিছু বার্ষিক ব্যবহারের পরিমাণ যথাক্রমে ০.৩৮ ও ২.৩০ ঘনফুট। অথচ একই জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত নেপাল ও বার্মার ব্যবহার প্রায় ২০ ঘনফুট (SFYP, 1983, পৃ. ১৪২)। ১৯৮৫-৮৬ সালের হিসেব মতে, দেশে কাঠ ও জ্বালানী কাঠের ব্যবহার ছিল যথাক্রমে ৩৮ ও ২৩০ মিলিয়ন ঘনফুট। এর মধ্যে বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমি থেকে যথাক্রমে ১৩.৩ ও ২৫.৫ মিলিয়ন ঘনফুট কাঠ ও জ্বালানী কাঠ সরবরাহ করা হয়েছে। বাকী ২৪.৭ ও ২০৪.৫ মিলিয়ন ঘনফুট কাঠ ও জ্বালানী কাঠের সরবরাহ হয়েছে গ্রামীণ বন থেকে। দেশের মোট বনভূমির মাত্র ১১ শতাংশ গ্রামীণ বন হিসেবে বিবেচিত (FFYP, 1990, পৃ. V. E. 1)। অথচ এখান থেকেই সামগ্রিকভাবে দেশে ব্যবহৃত কাঠের প্রায় ৭০ শতাংশ এবং জ্বালানীকাঠ ও বাঁশের প্রায় ৯০ শতাংশ সরবরাহ পাওয়া যায় (তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রতিবেদন, ১৯৮৩ পৃ. ২১৯)। কিন্তু প্রতিবছর যে হারে গ্রামীণ বন উৎসাদিত হচ্ছে পুনর্জন্ম ক্ষমতা তার তুলনায় অনেক কম। এ কথাটি যে শুধুমাত্র গ্রামীণ বনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা নয়, বরং তা সামগ্রিকভাবে দেশের সকল বনাঞ্চলের জন্যই একটি নির্মম সত্য।

সবচেয়ে আশংকাজনক বৈপরিত্য পরিলক্ষিত হয় বনসম্পদের সামগ্রিক চাহিদা ও যোগানের মধ্যে। দেশের বনসম্পদের পরিমাণ কমছে দ্রুতহারে ; বন এলাকার সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া লক্ষ্যমাত্রার অনেক নীচে পড়ে থাকছে। কিন্তু, অন্যদিকে মানুষের চাহিদার পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা থেকে সতত: উর্ধ্বগামী (MTR-TFYP, 1989, পৃ. ৯৫)। বর্তমানে সামগ্রিকভাবে দেশের প্রয়োজনীয় কাঠ ও জ্বালানী কাঠের চাহিদা যোগানের ব্যবধান যথাক্রমে ২৬.১২ ও ১২৯.৯১ মিলিয়ন ঘনফুট। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও ভোগস্তর বর্তমান অবস্থায় স্থির থাকলে ২০০০ সাল নাগাদ এ ব্যবধান যথাক্রমে ২৮.২ ও ১৪৫.২ মিলিয়ন ঘনফুটে দাঁড়াবে (সারণী-৩)। চাহিদা ও যোগানের মধ্যে এই বিরাট ব্যবধান সৃষ্টির প্রধান কারণ হচ্ছে সীমিত বনভূমি, জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ, ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন, নগরায়ন, শতবর্ষের পুরানো বন-আইনের দুর্বলতা ও প্রশাসনিক অব্যবস্থা।

সারণি-৩ : কাঠ ও জ্বালানী হিসেবে বনসম্পদের চাহিদা ও যোগান, ১৯৯০

	কাঠ (মি: ঘনফুট)	জ্বালানী কাঠ (মি: ঘনফুট)	২০০০ হাজার সাল নাগাদ অবস্থা (মি: ঘনফুট)	
			কাঠ	জ্বালানী কাঠ
চাহিদা	৪৬.৬০	২৭৯.৫৮	৫০.০	৩০৪.০
যোগান	২০.৪৭	১৪৯.৬৭	২১.৮	১৫৮.৮
ঘাটতি	২৬.১২	১২৯.৯১	২৮.২	১৪৫.২

উৎস: Ali, Omar M. : Bangladesh Forests with special reference to Demand and Supply of Fuelwood : a research mimio, BARC, Dhaka. 1990, p. 13.

বাংলাদেশের বনসম্পদ সংরক্ষণ ও বনায়ন : সফলতা এবং ব্যর্থতা

অতীতের পরিকল্পনাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, উচ্চাভিলাস ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ব্যর্থতাই হচ্ছে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই ব্যর্থতার জন্য যে কারণগুলোকে দায়ী করা হয়েছে তার স্বরূপও সকল ক্ষেত্রে মোটামুটি একই।

পরিকল্পনার আওতাধীনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। মূলত: দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকেই বনসম্পদ উন্নয়নের ওপর জোর দেয়া হয়। তবু প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা দু'টি ছিল অনেকটা ঔপনিবেশিক চেতনা লালিত। এ সময় বনসম্পদ উন্নয়ন থেকে সর্বোচ্চমাত্রায় বনসম্পদ আহরণের ওপর জোর দেয়া হয়েছে (তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রতিবেদন, ১৯৮৩, পৃ. ২১০-২১৭)। বনভূমি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার চাপ ও প্রয়োজনীয় জমির স্থলপতার বিষয়টি দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময় থেকে সর্বাধিক অনুভূত হয়। সে জন্য তখন থেকেই গ্রামীণ বনোন্নয়নের ওপর দৃষ্টি দেয়া হয়। মধ্য পর্যায়ে এসে দেশের উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলোর বনহীনতার প্রতিক্রিয়া রোধকল্পে একটি ব্যাপক বনায়ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। পরবর্তীতে এটি সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি (১৯৮২-১৯৮৭) নামে সারাদেশে বিস্তৃতি লাভ করে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রামীণ বনায়ন কর্মসূচি বিশেষ গতি পায় এবং একই সঙ্গে সংযোজিত হয় উপজেলা বনায়ন ও নার্সারী প্রকল্প (১৯৮৮-১৯৯৪), গুচ্ছগ্রাম ও বনায়ন এবং এনজিও-এর মাধ্যমে ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে বনায়ন। বিগত তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতাধীনে গৃহীত অসংখ্য প্রকল্পের মধ্যে উল্লিখিত প্রকল্পগুলো অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার এবং সর্বাধিক আলোচিত। এর মধ্যে এনজিও-এর মাধ্যমে গৃহীত বনায়ন কর্মসূচি যথেষ্ট ফলপ্রসূ বলে অনেকে মনে করেন। তবে সামগ্রিক বিচারে এনজিও'র মাধ্যমে গৃহীত বনায়ন কর্মসূচির ফলপ্রসূতার বিষয়টি প্রশ্নাতীত নয়।

বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে ব্যাপ্ত। ব্যাপক স্থানিক পরিসরে কর্মসূচি পরিচালনা করার মত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কোন এনজিও'র নেই। তাই এনজিও'রা স্বল্প পরিসরে ভাল ফলাফল দেখাতে পারলেও বৃহত্তর পরিসরে সরকারী প্রতিষ্ঠানের থেকে তুলনামূলকভাবে কম ফলপ্রসু; তুলনামূলক বৃহত্তর পরিসরে কার্যরত এনজিও'গুলোর অবস্থা থেকে অন্তত তাই মনে হয়—সাধারণত অনেকে এমন ধারণা পোষণ করেন। আবার অনেকের মতে, যে অর্থ ও লোকবল দিয়ে এনজিও'গুলো বনায়ন কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে তা' আপাতফলপ্রসু মনে হলেও কার্যত অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নয়। তবে তুলনামূলক বিচারে বন অধিদপ্তর থেকে অধিক অর্থ ও লোকবলের মাধ্যমে বনায়ন কর্মসূচি পরিচালনা করলেও তাদের কর্মসূচিতে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ অধিকতর নিশ্চিত হয়ে থাকে বলে অনেকে মনে করেন। ইদানিং ব্যক্তিগত পর্যায়ে বনায়নও জনমনে বেশ সাড়া যোগাচ্ছে। নিম্নে তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামগ্রিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের চিত্র তুলে ধরা হলো :

সারণি-৪ : বিভিন্ন এলাকার বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন কর্মসূচির অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা, ১৯৭৩-৯০

বৃক্ষাণ/বনায়নের ধরণ	দ্বিবার্ষিকসহ ১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৮০) (হেক্টর)	২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫) (হেক্টর)	৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০)	
			লক্ষ্যমাত্রা (হেক্টর)	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন (হেক্টর) (%)
১। কর্তিত প্রাকৃতিক পাহাড়ী বনাঞ্চলে পূণঃবৃক্ষরোপণ	২১,৭২৩	২৬,৮৮৩	৩০,৩৬০	১৮,১৭৩ ৬০
২। ক্ষয়িষ্ণু ও অনাবৃত সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বনায়ন	৬,৭৬১	১১,৮৮৬	৩৬,০০০	২,৩৭৬ ৭
৩। পার্বত্য চট্টগ্রামের অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনভূমিতে বনায়ন	৮,৪৪৬	১৭,৯৯৬	২৯,১৫০	১০,৭২১ ৩৭
৪। উপকূলীয় অঞ্চলে নতুন জেগে ওঠা ভূমিতে বনায়ন	৩০,৯৮২	৪০,৪১৫	৪০,৪৮৫	৩২,৫৫৩ ৮০
৫। Woodlot & Agroforestry Plantation	—	২,৯৩২	১৫,৬২৮	৫,৪১৩ ৩৫
৬। Strip Plantation (Km)	—	৩,৪১০	৪,৯৮০	৪,২৪১ ৮৫
৭। চারা বিতরণ (mln)	২৬.৭	২১	৭৬	৪২ ৫৫

এযাবতকালের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, উপকূলীয় বনায়ন ও strip plantations সর্বাধিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়েছে, যার পরিমাণ যথাক্রমে ৮০ ও ৮৫ শতাংশ (সারণী-৪)। সাম্প্রতিককালের এক জরীপে দেখা গেছে যে, উপকূলীয় অঞ্চলে রোপিত বৃক্ষের প্রায় ৭০ শতাংশ বেঁচে উঠেছে। এতদাঞ্চলের প্রধান সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে “কাণ্ড-খোঁড়ক” কীটের আক্রমণ। রোপিত বৃক্ষের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ এই আক্রমণের শিকার। তৃতীয় পরিকল্পনায় কর্তিত প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি মাত্র ৬০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়েছে, যা দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনায় অনেক কম। ক্ষয়িষ্ণু ও অনাবৃত বনাঞ্চলের বৃক্ষায়ন কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন প্রায় শূন্যের কোটায় (৭ শতাংশ)। “প্রজাতি-স্থানের” উপযুক্ততা নির্ধারণের ব্যর্থতাই এ সকল ক্ষেত্রে মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত। বৃক্ষায়ণে অসঙ্গত প্রজাতির মিশ্রণ ও দ্রুতবর্ধনশীল একক প্রজাতির বৃক্ষায়ণও ব্যর্থতার আর একটি প্রধান কারণ। সাম্প্রতিক এক জরীপে দেখা গেছে, একক প্রজাতির বৃক্ষশিশু অতিমাত্রায় পোকাকার আক্রমণের শিকার হয়। এছাড়া চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, রোগাক্রমণ, নিম্নমানের চারা ও বীজ, রোপণোত্তর পরিচর্যার অভাব ও প্রশাসনিক অদক্ষতা অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করেছে।

বন প্রশাসন ও বন ব্যবস্থাপনা

একটি সুষ্ঠু বন প্রশাসন ও বন ব্যবস্থাপনার দু'টি মৌলিক দিক হচ্ছে যুগোপযোগী আইনের ভিত্তি তৈরী এবং আইন প্রয়োগের জন্য একটি সুব্যবস্থিত, দক্ষ ও কার্যকরী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ দুটি বিষয়ই দীর্ঘ দিনের একটি অবহেলিত অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত।

১৯৮৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত প্রচলিত বন-আইন ছিল ভূতপূর্ব ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রণীত, যার মৌলিক ধারা ছিল নির্বিচারে বনোজাড়ের মধ্য দিয়ে কৃষির পল্লন ঘটানো এবং বনভূমি থেকে সর্বোচ্চমাত্রায় সম্পদ আহরণ। ১৯৮৯ সালেই প্রথমবারের মত প্রচলিত বন-আইন সংশোধনীর প্রয়াস নেয়া হয়। বিশেষজ্ঞমহলের অনেকেরই ধারণা, সংশোধিত এই বন-আইনটিও অনেক ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টতার অভাবদোষে দুর্বল। এছাড়া অনুভূত প্রয়োজনের আলোকে সময়ে সময়ে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহ এবং সামাগ্রিকভাবে সংশোধিত এই বন-আইনটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। এ অভিযোগ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ছাড়াও সরকারী দলিলপত্রেও স্বীকৃত (FFYP, 1990, পৃ. V. E. 2)। উদাহরণত ১৯৮৯ সালে ইটের ভাটায় লাকড়ির ব্যবহার নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু সারাদেশে এ আইনটি লঙ্ঘিত হচ্ছে ব্যাপকভাবে (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯৯১, পৃ. ৬)। তবে, শুধু আইন প্রণয়নই যথেষ্ট নয়। কোন আইন প্রণয়ন করার পূর্বে আইনের প্রয়োগযোগ্যতা ও প্রয়োগ কৌশলের বিষয়টিও বিবেচনায় আনা প্রয়োজন এবং সর্বোপরি, জনগণের হাতে বিকল্প কিছু তুলে দিতে না পারলে এ জাতীয় আইন

বাস্তবত: কখনোই কার্যকরী করা সম্ভব নয়। জনগণের মধ্যে বন-আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধি-প্রবিধি সংক্রান্ত অজ্ঞতাও অপরিকল্পিত এবং অননুমোদিত বনোৎসাদন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিজ্ঞমহলের অনেক অভিযোগ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে দূনীতিপরায়ণতা, দায়িত্বহীনতা, লোভী ও অসাধু ব্যবসায়ী ও চোরাকারবারীদের সাথে যোগসাজস রক্ষা করে চলা ইত্যাদি অন্যতম (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯৯১, পৃ. ৩ ও ৬)। এগুলো কঠোর হস্তে দমন করা না গেলে বিদ্যমান সমস্যার উত্তরণ বাস্তবে কখনোই সম্ভব নয়।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রতিবেদন মতে, বন বিভাগের বক্ষায়ণ প্রক্রিয়া খুবই অপ্রতুল। রোপণোত্তর পরিচর্যার অভাবে বেশীর ভাগ গাছই মারা যাচ্ছে এবং এগুলোর প্রতিস্থাপন হচ্ছে না। বন বিভাগ, বন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এজেন্সীর মধ্যে কোন কার্যকরী সমন্বয় গড়ে ওঠেনি। পরিবেশ নীতিতে জ্বালানী, বন, বন্য প্রাণী ও জৈব বৈচিত্র্য খাতের নীতিসমূহের বাস্তবায়নকারী সংস্থা নির্ধারণ অধিকতর প্রয়োগযোগ্য হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে এবং এ সকল সংস্থাসমূহের মধ্যে একটি কার্যকরী সমন্বয় গড়ে তোলার ব্যাপারে ব্যাপক প্রয়াস আবশ্যিক। গবেষণার সাথে বাস্তব প্রয়োজনের তেমন কোন মিল নেই। আশির দশকে বন বিভাগকে পূণর্গঠনের প্রয়াস নেয়া হলেও তা বিশেষ কোন উপকারে আসেনি (FFYP, 1990, পৃ. ৪-৫)। সত্তরের দশকে সুইডিশ আর্থিক সহযোগিতায় বন বিভাগের একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও পরবর্তীতে কার্যত অর্থের অভাবে সেটা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বন উপখাতে ৮৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এটাই এই উপখাতে এ যাবতকালের সর্বাধিক বরাদ্দ। পরিকল্পনায় দেশের বনসম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট এজেন্সীসমূহের পুনর্বিন্যাসকরণ, সমন্বয় ইত্যাদি পদক্ষেপের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, তুলনামূলক বিচারে আমাদের দেশের প্রশাসনিক উপরি কাঠামো (অর্থাৎ লিখিত নীতিমালা, পরিকল্পনা, প্রণীত আইন ও প্রশাসনিক স্তরবিন্যাস ইত্যাদি) দৃশ্যত অত্যন্ত চমৎকার। কিন্তু ভেতর কাঠামো (অর্থাৎ বাস্তবায়ন, জবাবদিহিতা, সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ ও পদায়ন ইত্যাদি) অত্যন্ত দুর্বল ও যথার্থ কার্যকরী নয়। এর গোড়ায় হাত দেয়া না গেলে সমস্যার উত্তরণগতি শ্লথ হতে বাধ্য।

গৃহীতব্য ভবিষ্যৎ কর্মসূচি

দেশের বনসম্পদের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে সুপারিকল্পিত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। অন্যথায় আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এক অপ্রতিরোধ্য আর্থ-পরিবেশ ও প্রতিবেশগত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। অবশ্য চলতি অবস্থা বিরাজ করলে বর্তমান প্রজন্মও এ হুমকির বাইরে নয়। এ সমস্যার উত্তরণে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে :

কাঠ ও জ্বালানী কাঠের ব্যবহার কমানোর পদক্ষেপসমূহ

- সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সলিড কাঠের ব্যবহার সীমিত করতে হবে। এ সকল ক্ষেত্রে বিকল্প দ্রব্যাদি যেমন পারটেক্স ইত্যাদির ব্যবহার সম্প্রসারিত করতে হবে এবং জনগণকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। কেননা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কারণে জনসাধারণের মাঝে সলিড কাঠের ব্যবহার প্রাধান্য পেয়ে থাকে।
- কাঠ আহরণ ও চেলাইকরণের সময় প্রচুর কাঠ নষ্ট হয়। এ সমস্যার সমাধানে আহরণ ও চেলাইকরণ পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটাতে হবে।
- অনেক ক্ষেত্রেই স্থলপসময়ে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে কাঠ ব্যবসায়ীরা কাঠকে প্রক্রিয়াজাত করেনা। দীর্ঘায়ু করার জন্য কাঠ ব্যবহারের পূর্বে অবশ্যই প্রক্রিয়াজাত করতে হবে। এব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
- ১৯৮৯ সাল থেকে ইটের ভাটায় লাকড়ির ব্যবহার নিষিদ্ধ করে যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তার সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
- জ্বালানীকাঠের বিকল্প উৎস, যেমন গ্যাস, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য লাগসই বিকল্পের ব্যবহার সম্প্রসারিত করতে হবে।

বনায়নের পদক্ষেপসমূহ

দেশের বর্তমান আর্থ-পরিবেশ ও প্রতিবেশগত প্রয়োজনে পর্যাপ্ত বনায়ন অতীব জরুরী এবং এই বনায়ন প্রক্রিয়াটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ভিত্তিক ও পরিকল্পিত উপায়ে পরিচালিত হতে হবে। এজন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা অত্যাৱশ্যক :

- যে সকল এলাকায় বনায়নের সুযোগ রয়েছে সেখানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বনায়ন করা।
- বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির অনাবৃত এলাকায় সুষ্ঠু পুনর্জন্ম ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য নিবিড় গবেষণার মাধ্যমে “স্থান-প্রজাতি”র যথোপযুক্ততা যাচাই ও রোপণযোগ্য বিভিন্ন “প্রজাতির সংগতিপূর্ণ মিশ্রণ” ব্যবহার করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নিতে হবে।
- উপকূলীয় বনায়নের ওপর আরো জোর দিতে হবে। সুন্দরবন এলাকার প্রাকৃতিক পুনর্জন্ম প্রক্রিয়া সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক ঘূর্ণীঝড়, জলোচ্ছাস ইত্যাদি প্রতিরোধে স্থানীয় প্রকৃতির

বনায়নের সাথে উপকূলের সম্মুখভাগে নারিকেল, খেজুর, তাল জাতীয় বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে একটি বিস্তৃত “গ্রীণ বেল্ট” সৃষ্টি করতে হবে।

- জ্বালানীকাঠের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে সংগতিপূর্ণ মিশ্রণ আকারে স্বল্পমেয়াদী আবর্তক জাতের বৃক্ষ বা দ্রুতবর্ধনশীল বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত অনাবৃত বনাঞ্চলে উপযুক্ত ক্ষেত্রে এ জাতীয় বৃক্ষায়ণ করা যেতে পারে।
- গ্রামীণ বনায়ন প্রক্রিয়াকে আরো জোরদার করতে হবে এবং সামাজিক সংগঠন ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে বনায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য জনগণকে অধিকতর উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
- সম্ভাব্য শীঘ্র একটি পূর্ণাঙ্গ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়াস নিতে হবে এবং ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় বনাঞ্চল সংরক্ষণ ও বনায়নের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে।

ব্যক্তিগত, সামাজিক সংগঠন বা সরকারী উদ্যোগ—যেভাবেই বনায়নের পদক্ষেপ নেয়া হোক না কেন, বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমি ছাড়াও গ্রামীণ এলাকায় ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমিতে যেমন বসতির আশে-পাশে, যোগাযোগ পথের দু’ধারে এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে অনাবাদী জমিতে বৃক্ষায়ণ সম্ভব। শহরাঞ্চলের বনায়ন প্রক্রিয়ায় একটি ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। শহর ও নগর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় বনায়ন পদ্ধতির সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকা আবশ্যিক (Mueller, 1970, পৃ. ৬৩), যা আমাদের দেশের ক্ষেত্রে প্রধানত অনুপস্থিত। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে শহর ও নগর বসতির ধরণ, ভূমিমূল্য ও ভূমির অপ্রতুলতা ইত্যাদি বিষয়কে বিবেচনা করে শহরাঞ্চলে একটি কার্যকরী বনায়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়োজন রয়েছে।

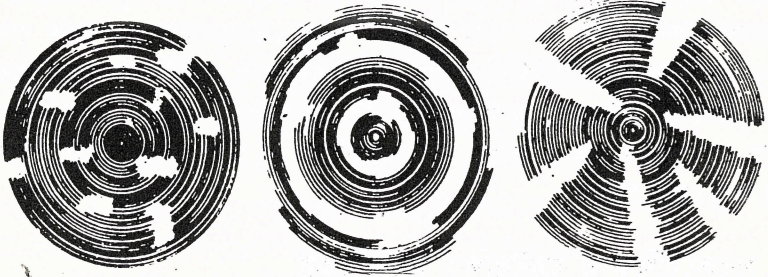
(ক) দ্বীপাকার পদ্ধতির বনায়ন

ঘনসন্নিবিষ্ট জনবসতি, ভূমির অপ্রতুলতা, অত্যাধিক ভূমিমূল্য ইত্যাদি কারণে দেশের বড় বড় নগরী ও শহরগুলোতে নতুনভাবে পরিকল্পিত উপায়ে বনায়ন করা খুবই দূরূহ এবং শহরের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে প্রয়োজনীয় বনায়ন এক্ষেত্রে অসম্ভব। সেজন্য দ্বীপাকার পদ্ধতির বনায়ন (চিত্র-১) এসমস্ত এলাকার জন্য সবচেয়ে উপযোগী। শহরের বিভিন্ন স্থানে বসতির আশে-পাশের খালি জায়গায়, যোগাযোগ পথকে ঘিরে অথবা উদ্যান কৃষি হিসেবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের আকারে এজাতীয় বনভূমি গড়ে উঠতে পারে। এজাতীয় বনায়নের অসুবিধা হচ্ছে, এলাকার আবহাওয়া ও জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে তা পর্যাপ্ত অবদান রাখতে সক্ষম নয়। তবু বিকল্প বনায়ন পদ্ধতির সীমাবদ্ধতার কারণে এক্ষেত্রে উল্লিখিত পদ্ধতিই সার্বিক দিক বিবেচনায় যথোপযুক্ত।

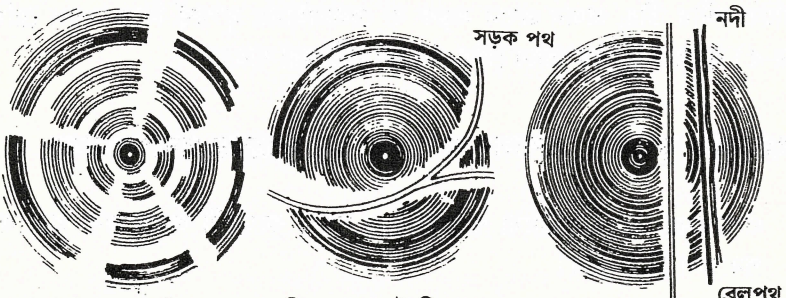
(খ) সবুজ রিং-আকার পদ্ধতির বনায়ন

সাধারণত বসতিকে রিং-এর আকারে ঘিরে এজাতীয় বনভূমি গড়ে ওঠে এবং একটি শহর বসতিতে স্তরাকারে কয়েকটি রিং থাকতে পারে (চিত্র-২)। দেশের ছোট ছোট শহরগুলোতে যেমন থানা শহর ও নব্য পরিকল্পিত শহরগুলোতে এজাতীয় বনায়ন করা যেতে পারে। দ্বীপাকার বনভূমির তুলনায় এর সুবিধা অনেক বেশী। এক্ষেত্রে বনভূমি বসতিকে রিং-এর আকারে ঘিরে থাকে বলে বায়ুশোধন প্রক্রিয়ায় এটি একটি নিবিড় ফিল্টারের কাজ করে।

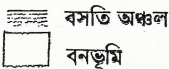
চিত্র ১-৬ : বনায়ন পদ্ধতি



চিত্র-১ : দ্বীপাকার পদ্ধতি চিত্র-২ : সবুজ রিং-আকার পদ্ধতি চিত্র-৩ : সবুজ আঙ্গুলাকার পদ্ধতি



চিত্র-৪ : সমন্বিত সবুজ রিং-আকার ও সবুজ আঙ্গুলাকার পদ্ধতি চিত্র-৫ : বহুরৈখিক সবুজ চত্বর চিত্র-৬ : সরলরৈখিক সবুজ চত্বর



(গ) আঙ্গুলাকার পদ্ধতির বনায়ন

এ পদ্ধতিটিও নব্য পরিকল্পিত এবং থানা শহরগুলোর জন্য বিশেষ উপযোগী। শহর কেন্দ্র থেকে শহরতলীর দিকে আঙ্গুলের মত বর্ধিত থাকে বলে একে আঙ্গুলাকার বনায়ন পদ্ধতি বলা হয় (চিত্র-৩)। আবার দৃশ্যত: কেন্দ্র থেকে বিচ্ছুরিত আলোক রশ্মির মত দেখায় বলে একে “বিচ্ছুরিত সবুজ চত্বর” এবং কখনো কখনো “সবুজ করিডোর” বলা হয়। এজাতীয় বনভূমি শহরাভ্যন্তর ও বহির্ভাগের মুক্ত ভূমির মধ্যে বায়ুর আদান-প্রদানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে এবং শহর এলাকার বায়ু শোধন করে।

(ঘ) সমন্বিত রিং-আকার ও আঙ্গুলাকার বনায়ন পদ্ধতি

এই সমন্বিত পদ্ধতিটি (চিত্র-৪) হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে একটি শহরের সর্বোৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যকর বায়ু ব্যবস্থা উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। এক্ষেত্রে সবুজ রিংগুলো বায়ু বিশুদ্ধকরণ ছাক্তীর কাজ করে এবং বিচ্ছুরিত সবুজ চত্বরগুলো শহরে স্বচ্ছন্দ বাতাস আগমন-নির্গমনের করিডোর হিসাবে কাজ করে। এছাড়া এ পদ্ধতির বনায়নের মাধ্যমে শহরের পরিবেশ, প্রতিবেশ, আবহাওয়া ও জলবায়ু সংক্রান্ত অন্যান্য উপাদানগুলোও নিয়ন্ত্রিত হয়। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে দেশের নব্য পরিকল্পিত ও থানা শহরগুলোতে এজাতীয় বনায়ন করা যেতে পারে।

(ঙ) সরলরৈখিক ও বক্ররৈখিক সবুজ চত্বর

অনেক সময় শহরাঞ্চলে বনায়নের জন্য পর্যাপ্ত খালি জায়গা থাকেনা। এজন্য পূর্বালোচিত পদ্ধতি অনুসরণে বনায়ন সম্ভব হয় না। কিন্তু এ সকল শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীর তীর, প্রধান প্রধান সড়ক বা রেললাইনের দু'পার্শ্ব দিয়ে ‘সরল রৈখিক’ (চিত্র-৫) বা ‘বক্র রৈখিক’ ভাবে (চিত্র-৬) বন সৃষ্টি করা যায়।

সাংগঠনিক কাঠামো, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পদক্ষেপসমূহ

- প্রশাসনের ভেতর কাঠামো শক্তিশালী ও যথার্থ কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।
- বন-আইনের যথার্থ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে সৃষ্ট সমস্যার আলোকে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং সংশোধিত বন-আইনে (১৯৮৯) এগুলোর সংযোজন ঘটাতে হবে। জনসাধারণের মাঝে বন-আইনের স্বচ্ছতা আনায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।
- অসদুপায় ও অননুমোদিত বনোৎসাদনের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

- বৃক্ষের রোপণোত্তর পরিচর্যা ব্যবস্থার ওপর সর্বাধিক জোর দিতে হবে ও তার সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে।
- গৃহীত প্রকল্পসমূহ প্রয়োজনের সময় অর্থাভাবে যাতে ব্যাহত না হয়, সে জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের অবমুক্তি প্রক্রিয়া সহজতর করতে হবে এবং গৃহীত প্রকল্পসমূহসহ সামগ্রিক কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয়নের ওপর অধিকতর জোর দিতে হবে।

উপসংহার

বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে বনোন্নয়ন যতটা না অর্থনৈতিক কারণে জরুরী তার থেকেও বেশী জরুরী প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশগত প্রয়োজনে। তবে দেশের অর্থনীতিতে এই উপখাতের অবদানও নিতান্ত অবহেলারযোগ্য নয়। ভবিষ্যৎ অর্থনীতিতে এই উপখাতের প্রত্যক্ষ অবদানের চেয়ে পরোক্ষ অবদানের সম্ভাবনাই বেশী। একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির উন্নয়নে বনসম্পদ একরকম অগুচ্চটকের ভূমিকা পালন করে। প্রয়োজনীয় মাত্রায় বনোন্নয়ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধের মাধ্যমে যেমন সমৃদ্ধির সোপান সৃষ্টি করে, তেমনি এর অপ্রতুলতা অর্থনৈতিক উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সে কারণে বনসম্পদের উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ অতীব জরুরী। তবে, আমাদের এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এককভাবে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠি, সংগঠন বা সরকারের পক্ষে এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। এ দায়িত্ব আমাদের সকলের, সমগ্র জাতির।

গ্রন্থ নির্দেশিকা

- ১ Ahmed, Nafis and Khan, Fazle Karim, : The Sundarban Forests of East Pakistan : a Resource Appraisal, Oriental Geographer, Dhaka, July 1959.
- ২ Ali, Omar M. : Bangladesh Forests with Special Reference to Demand and Supply of Fuelwood. a research minio, BARC, Dhaka, 1990.
- ৩ Barner, J : Experimentelle Landschaftsoekologie : Lehrbuch der Umweltforschung. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1983.
- ৪ Curtis, S. J. : Working Plan for the Forests of the Sundarban Division. Vol. 1 Part 1, Calcutta, 1933.
- ৫ Geiger, R. : Klima der bodennahen Luftschicht. Vieweg, Braunschweig, 1961.
- ৬ Government of the People's Republic of Bangladesh. : The First Two Year Plan, 1978-80. Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka, 1978.
- ৭ Government of the People's Republic of Bangladesh : The Second Five Year Plan, 1980-85, Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka, 1983.
- ৮ Government of the People's Republic of Bangladesh : The Mid-Term Review of the Third Five Year Plan, 1985-90 . Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka, 1989.
- ৯ Government of the People's Republic of Bangladesh. : The Fourth Five Year Plan, 1990-95. Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka, 1990.
- ১০ Government of the People's Republic of Bangladesh. : National Conservation Strategy of Bangladesh---Towards Sustainable Development ; Ministry of Environment and Forest, Dhaka, 1991.
- ১১ Haupt, R. : Beitrag zum Problem der Laermminderung durch Waldbestaende. Archiv fuer Naturschutz and Landschaftsforschung, Heft 13/14, 1973/94.
- ১২ Miess, M. : Umweltoekologische Aspekte staetischer Siedlungsraeume. In : Meyer, F. H. : Baeume in der Stadt ; Ulmer, Stuttgart, 1978.
- ১৩ Mueller, W. : Staedtebau. Teubner, Stuttgart. 1970.

১৪ Nishat, Ainun. : Key Issues of Environmental Concern for Bangladesh ; Seminar Paper, BPATC, Savar, Dhaka, 1993.

১৫ Rashid, Harun Er. : Geography of Bangladesh. University Press Ltd., Dhaka, Bangladesh, 1977.

১৬ Rashid, Harun Er. : Geography of Bangladesh. University Press Ltd., Dhaka, Bangladesh, 1991.

১৭ The World Bank : Indonesia : Sustainable Development of Forests, Land and Water, a World Bank country study, Washington D. C., 1990.

১৮ Zellentin, Gerda : Oekologie und Oekonomie in europaeischer Dimension : Moeglichkeiten und Grenzen einer Umweltpolitik der Europaeischen Gemeinschaft. In : Europaeische Themen im Unterricht, Bundeszentrale fuer politische Bildung, Band 254, 1987.

১৯ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জরিপ, ১৯৮০-৮১.

২০ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জরিপ, ১৯৮৩-৮৪.

২১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৮৫-৯০. পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮৩।

২২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : পরিবেশ নীতি ১৯৯২ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম ; পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৯২।

২৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : বাংলাদেশের পরিবেশ ও পরিবেশ অধিদপ্তর ; পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা, ১৯৯০।

২৪ চট্টগ্রামের কাঠচোরদের দৌরাত্ত : সরকারী বনাঞ্চল উজাড়. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩.০৯.১৯৯১ ইং।

২৫ চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম. : আর্থনীতিক ভূগোল : বাংলাদেশ ও বিশ্ব. দি সিটি প্রেস, ঢাকা, ১৯৮৮।

২৬ মণ্ডল, দীপংকর ও খান, মোর্শেদুল আনোয়ার. : বাংলাদেশের পরিবেশ উন্নয়নে সামাজিক বনায়ন ; দ্বাদশ বুনীয়াদী প্রশিক্ষণে উপস্থাপিত সেমিনার প্রবন্ধ, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা, ১৯৯৪।

২৭ মাসুদ, আলম : বাংলাদেশের বিপর্যস্তকর পরিবেশ : প্রধান ইস্যুসমূহ : পরিবেশ ও আমরা, পরিবেশ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, ঢাকা, ১৯৯৩।

২৮ সিদ্দিকী, গিয়াস. : সবুজ স্বর্ণ : বনদস্যুদের তৎপরতা ; পরিবেশ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা, ১৯৯৪।

২৯ হোসেন, এম মোজাম্মেল : বাংলাদেশের বনসম্পদ, জ্বালানী শক্তির চাহিদা ও সম্ভাবনা. একটি গবেষণা মিমিও, ১৯৯০।

সংযোজনী-১ : প্রকৃতি অনুসারে বনের শ্রেণীবিন্যাস, অবস্থান ও সম্পদের পরিমাণ, ১৯৯০

বনের শ্রেণী	অবস্থান	প্রধান জাতসমূহ	এলাকার পরিমাণ (মিঃ একর)	সম্পদের পরিমাণ (মিঃ ঘনফুট)
১। পাহাড়ী বন	বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলা তেলসুর, গামার, তুন টেকিজাম, কড়ই, টিক, প্রভৃতি	গরান, চাপালিকা, সিভিট, চম্পা,	১.৬৫	১,১৬৫.২০
২ক। প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন	বৃহত্তর খুলনা ও পটুয়াখালী জেলা গোলপাতা প্রভৃতি	সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, বিন, গরান, পশুর,	১.৪৬	৪৮৯.৬১
২খ। উপকূলীয় বন	বৃহত্তর পটুয়াখালী, এবং চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় অঞ্চল	কেওড়া ও বিন	০.৩০	
৩। সমতুল ভূমির শালবন	বৃহত্তর ঢাকা, ময়মন- সিংহ টাঙ্গাইল, রাজশাহী, দিনাজপুর রংপুর জেলা	শাল, কড়ই, হলদী, ভাদী, বহেড়া, আমলকী প্রভৃতি	০.৩০	৫১.৮৯
৪। গ্রামীণ বন	সমগ্র বাংলাদেশ	বিভিন্ন ধরনের গাছপালা ফলের গাছ ও বাঁশ প্রভৃতি	০.৬৭	১,৯৩১.৮০
মোট			৪.৩৮	৩,৬৩৮.৫০

উৎস: Ali, Omar M. : Bangladesh Forests with Special Reference to Demand and Supply of Fuelwood ; a research mimio, BARC, Dhaka, 1090.